সত্যবতী, সুবর্ণলতাদের ফিরে দেখা

উপাসনা ঘোষ,
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারীদিবস এলে, একটা ভাবনা কিছুতেই মাথা থেকে সরিয়ে দিতে পারিনা যে, আর কতোকাল বিশেষ করে একদিন নারীদিবস হিসেবে পালন করতে হবে!!! ভারতের মতো দেশে, যে দেশে দেবতার তুলনায় দেবীর সংখ্যা বেশি এবং পূজিতও হয় বেশি, সে দেশে এখনও মেয়েরা কতোখানি অবলা, এখনও তারা কতোখানি শক্তিহীন যে তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে, ''উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত''!! দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নারীজনসংখ্যার অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যককে বাদ দিলে অধিকাংশের জীবনের বেঁচে-থাকার কাহিনি আজও বড় দুঃখের, বড় অশান্তির। প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমে নারী-নির্যাতনের যে সংবাদ এবং তথ্য পাই, তা আমাদের বিষণ্ন করে, আশঙ্কিত করে। তবে, পাশাপাশি আশার কথা এটাই যে, ভেঙে না-পড়ে, নিজেকে অসহায় না-ভেবে অনেক মেয়েরাই আজ নিজের মতো বেঁচে-থাকার পথ খুঁজে পেতে লড়াই করছেন। এঁদের প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায়, সত্যবতী, সুবর্ণলতার কথা।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় একালের সাহিত্যিক বাণী বসু, সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে মহিলা-লেখকদের প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গে সিমোন দ্য ব্যুভোয়ারের অনুসরণে বলেছিলেন, ''মেয়েদের দুরকম প্রতিবন্ধক পেরোতে হয়। প্রথমত, নারী-পরিচয়ের হীনমন্যতা, সংকোচ-সংস্কারের প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়ত, অনেক যুগের দৌড়ে স্বভাবতই এগিয়ে-থাকা পুরুষের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতার বাধা।'' এই দুটি প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বিশ শতকের বাঙালি বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারের আত্মপ্রকাশেচ্ছু মহিলাদের আরও দুটি অনিবার্য প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হয়েই নিজের লেখালেখি চালাতে হয়েছে— এক, স্বামী এবং পরিবারের অসহযোগিতা; দুই, সারাদিন গৃহস্থালির শ্রমকঠোর দায়িত্বপালন। ''নারীপরিচয়ের হীনমন্যতা'' আশাপূর্ণার ছিলো না, তবে লেখিকা হিসেবে আশাপূর্ণাকেও মর্যাদা অর্জনের লড়াই করতে হয়েছিলো পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত বাংলার সাহিত্যসমাজে। সাহিত্য রচনায় এবং প্রকাশে স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা সত্ত্বেও, তাঁর জীবনকথাতেই সাক্ষ্য মেলে, আত্মীয়-অভ্যাগত-সমাবৃত সংসারের কর্তব্য, দায়িত্ব যতদিন শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন, অকাতরে হাসিমুখে সামলেছেন। ঘর-সংসারের কাজকর্ম যথাসাধ্য করেই উদ্বৃত্ত সময়ে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর মনের দরজায় ভিড় করে এসেছে, সেই সব নারীরা যারা 'মেয়েমানুষ'-পরিচয় ছাড়িয়ে শুধুই 'মানুষ' পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছে আর তার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের পরিবারেই লড়াই করেছে শেষ শক্তিবিন্দুটি পর্যন্ত।

২০২১ সালে বসে, ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এবং ১৯৬৭তে প্রকাশিত 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের 'সত্যবতী' এবং 'সুবর্ণলতা' চরিত্রদুটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে, আমরা উপলব্ধি করি, বাইরের পোষাকে

অনেকখানিই পরিবর্তন হলেও সমাজের প্রকৃত চেহারায় পার্থক্য খুব কমই ঘটেছে। সমস্যা আছে নতুন নামে, নতুন সাজে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আশাপূর্ণা মূলত পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুসমাজভুক্ত পরিবারের কাহিনি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলির বহুল অনুবাদ আমাদের বুঝিয়ে দেয়, দেশ-কাল-নির্বিশেষে পরিবার জীবনের কাহিনি লিখেছেন তিনি।

সময়ের এক বিরাট প্রেক্ষাপট আশাপূর্ণা ধরেছেন তাঁর ট্রিলজিতে। প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা—তিনটি উপন্যাসই এপিক উপন্যাসের মর্যাদাধর্মী। তাঁর ট্রিলজি রচনার পরিকল্পনা সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে (২-২-১৯৯১, দেশ পত্রিকা) তিনি জানিয়েছেন, ''মোটামুটি তিনটে কালকে ধরে রাখতে চেয়েছি। যে কালটাকে আমি দেখিনি, শোনার জগতে আছে ঠাকুমা, দিদিমা আর বড় বড় মাসিমা, পিসিমাদের মাধ্যমে সেটা হলো 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র কাল। আর 'সুবর্ণলতা'-র কালটাকে দেখেছি ছেলেবেলায়। তৃতীয়টাতো আমার চোখের সামনে ঘটে যেতে দেখা। উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরের ইতিহাস নিয়ে লেখার। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ভূমিকায় সে কথা বলেওছি। পুরুষদের রচিত ইতিহাসগুলোতে চিরদিনই অন্তঃপুরের প্রেম এবং তাই নিয়ে যা সংঘর্ষ যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, সমাজজীবনের মুক্তির চেষ্টা নিয়ে ততটা নয়। সে লেখা অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি যেন উদাসীন।'' অর্থাৎ একটি বিশেষ চরিত্রকে আশ্রয় করে তিনি গোটা সময়কে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর বলা 'অন্তঃপুরের ইতিহাস' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই জন-মানসিকতার প্রকৃত ইতিহাস গড়ে তোলে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে সময়ের দলিল রেখে যায়।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস থেকে 'স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালে'র ভাঙাগড়ার কাজের মধ্য দিয়েই 'সমাজের, যুগের সমাজমানুষের মানসিকতার' রঙ বদলের ছবিটি তুলে ধরার কাজটি শুরু করেছেন আশাপূর্ণা। তিনি আমাদের নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেন, রাষ্ট্র বা সমাজজীবনে পরিবার নামক এককটির গুরুত্ব। একজন বা দুজন মহামানবের আবির্ভাবে গোটা সমাজজীবন বদলে যায় না। প্রথম প্রতিশ্রুতির ঘটনাবিন্যাসের যে সময়কাল তা বাংলার নবজাগরণের ফলশ্রুতি বহনের কাল। বাংলার সে নবজাগরণ কেনো সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ছিলো, তা আশাপূর্ণা আমাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ''নারী তুমি অর্ধেক আকাশ'' বলে যতই কাব্য করা হোক, বাংলার ঘরে ঘরে অগণিত নারীর যথার্থ শিক্ষা, বুদ্ধির মুক্তি নিয়ে একজন দুজন বিদ্যাসাগর কর্মব্রতী হলেও গোটা বাঙালি সমাজ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়নি। ফলতঃ, অশিক্ষিত কুশিক্ষিত মায়ের দ্বারা লালিত সন্তানেরা যে, দেশের সংস্কৃতিগত পরিবর্তন আনতে পারে না, আশাপূর্ণার উপন্যাসে আমরা সে সত্যেরই প্রতিফলন দেখি। অন্তঃপুরের ক্ষমতা যে মহিলা বা যাদের হাতে থাকতো, তারাও যে কোনও অংশে কম ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, বা হিংস্র ছিলো না, আশাপূর্ণার বিভিন্ন উপন্যাসের নানান চরিত্রের মধ্যে তার অসাধারণ শিল্পনিপুণ রূপায়ণ, আমাদের বিস্মিত করে।

বিশেষ করে উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে ছিলো যৌথ পরিবারের আধিক্য। অনেক সময়ই দেখা যেতো, পরিবারের মধ্যে দলবদ্ধ সংঘশক্তির বিরুদ্ধে আশাপূর্ণার মুখপাত্র চরিত্রটিকে নিজের আদর্শ রক্ষা করার জন্য প্রায় আজীবন লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করতে করতে শুধু ক্ষতবিক্ষতই হয়েছে সে মানুষটি। কিন্তু পরিবারের অচলায়তনিক ভাবনার বদল ঘটাতে পারে নি। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সূচনায় যেমন তিনি

জানিয়ছেন— ‘‘সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয় তো আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। ‘সুবর্ণলতা’ সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।”

বস্তুত আশাপূর্ণা সেই অর্থে তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। তাঁর প্রতিবাদ ছিলো মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে। আর তাঁর বাস্তবসচেতন চোখ দেখেছে, পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যেই চলে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য হিংসা-বিদ্বেষের প্রবল স্রোত। বিশেষ করে নারীর বিরুদ্ধে নারীর হিংসা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তিনি সরব হয়েছেন বেশি। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজন মহলে, প্রতিবেশীদের পরিবারেই তিনি দেখেছেন, দুর্বল অসহায়ের ওপর ক্ষমতাভোগীর আধিপত্যের নির্লজ্জতা; বিশেষ করে পরিবারে নবাগতা বধূ, কিংবা আশ্রিতা— এমন নির্ভরশীল মেয়েদের দুর্দশার শেষ ছিলো না। যদিও তিনি মনে করতেন, একজন নারীর শত্রু অপর একজন নারীই, যা তিনি বলেওছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে; তবু আমরা দেখবো তাঁর কথাসাহিত্যে নির্মিত চরিত্রসংখ্যায় বিভিন্ন চেহারার, বিভিন্ন অবস্থানের, বিভিন্ন মানসিকতার মেয়েদেরই ভিড় বেশি। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ‘‘নিজে একজন নারী বলেই বোধহয় নারীদের সমস্যাটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। আমার রচনাতেও তাই নারীচরিত্রের প্রাধান্য ঘটেছে। আমাদের সমাজে বিশেষ করে আমাদের সময়ে মেয়েরাই ছিলো সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। অথচ তারাই ছিলো এই অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অসচেতন। নিজে নারীদের যে সমস্যাগুলিকে বড় বলে মনে করেছি নিজের লেখার মধ্য দিয়ে সেগুলিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।” (সাক্ষাৎকার ১৯৯০)।

পরিবারের বয়স্কা, বিধবা অথবা সধবা কর্ত্রীরা যারা পারিবারিক অবস্থানের সুযোগে ক্ষমতা ভোগ করতো, তারা নিজেদের অধিকার এবং অবস্থান সুরক্ষিত রাখতে প্রায়শই হিংস্র হতো। সত্যবতীর শাশুড়ি ‘এলোকেশী’ এবং সুবর্ণলতার শাশুড়ি ‘মুক্তকেশী’— চরিত্রদুটির মধ্য দিয়ে পারিবারিক অবস্থানের সুযোগে ক্ষমতাভোগ এবং নিষ্ঠুরতার ছবি এঁকেছেন আশাপূর্ণা। যার কিছু তিনি দেখেছেন তাঁদের পরিবারে, তাঁর ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর কাজকর্মে। যিনি নিজে একজন নারী হয়েও নারী-জাত সম্পর্কেই অত্যন্ত নীচু ধারণা পোষণ করতেন। সাধারণ জনজীবনে মেয়েদের সম্পর্কে যে ধারণা ছিলো, আশাপূর্ণা তাঁর এই ট্রিলজিতে তারই বিবর্তন দেখিয়েছেন। আজও কন্যাসন্তান-জন্ম সাধারণ ভারতীয় মানসিকতায় সাদরে গৃহীত হয়নি।

সত্যবতী, সুবর্ণলতার লড়াই ছিলো, ‘মেয়েমানুষ’ থেকে ‘মানুষ’ হয়ে ওঠার; মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাবার। পরিবারের মিলিত-শক্তির বিরুদ্ধে একক সামর্থ্যে সংগ্রাম করেছে সত্যবতী, সুবর্ণলতা। শ্বশুরবাড়ির অমার্জিত অভদ্র পরিবেশে প্রতিনিয়ত ধাক্কা খেতে খেতে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে তারা। প্রায়শই বিশ্বাসভঙ্গের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। সত্যবতীর জীবনে তার চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ববান পিতা রামকালী চাটুজ্যের প্রভাব ছিলো অপরিসীম। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে নিম্নরুচির, নিম্নমেধার এবং নিম্নচরিত্রের মানুষদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সত্যবতী এবং তার কন্যা সুবর্ণলতা চরিত্রদুটি মানুষ হিসেবে তাদের অন্তর্নিহিত সৌকুমার্য হারিয়ে ফেলেছিলো। সত্যবতী জীবনের সামান্য বড় একটা প্রেক্ষাপট যদিও বা পেয়েছিলো, নিজের অনুকূলে আনতে পেরেছিলো জীবনের কিছু সময়; সুবর্ণলতার সারা জীবন কেটেছে ভয়াবহ এক অন্ধকূপে। তার বিবাহিত জীবন শুরুই

হয়েছিলো নিদারুণ এক বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে। ঠাকুমার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলো আট/নয় বছরের সুবর্ণলতা। মায়ের অবর্তমানে তার ঠাকুমা ঐ শৈশবেই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো, শুধু মাত্র পুত্রবধূর প্রতি হিংসায়। সত্যবতীর বাবা তাকে গৌরীদান করেছিলেন। সত্যবতীর মেয়ের পরিণতিও হলো তাই। উপস্থিত ছিলো তার বাবা নবকুমার; মাতৃঅনুগত নবকুমার তার মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে নাবালিকা মেয়ের প্রবঞ্চনার, শঠতার বিবাহ আটকাতে পারেনি।

শুধু কি শ্বশুরবাড়িতেই মেয়েদের গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হতে হয়? পিতৃগৃহও কি নিরাপদ মেয়েদের জন্য? যেখানে তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবার কথা, বা, পাওয়া স্বাভাবিক, সে কি পায় সেই আশ্রয়? সুবর্ণলতার এই প্রবঞ্চিত অভিজ্ঞতা সে যুগে বিরল ছিলো না, আজকের দিনেও নয়। বাস্তব ঘটনার অবলম্বনে আশাপূর্ণা এই কাহিনি নির্মাণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু শ্রীনাথ দাস তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূর বিলাতবাসকালে, তাঁদের অগোচরে, নাবালিকা পৌত্রীর বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পরিশ্রম সে যুগেও সার্থক হয়নি, এই ২০২১ সালেও নয়। আজও খবরের কাগজের পাতায় নাবালিকার বিবাহদান প্রচেষ্টার সংবাদ জায়গা করে নেয়। তবে এখন প্রতিরোধের চেষ্টা হয়। সেটাই আশার কথা।

সত্যবতী, সুবর্ণলতাদের যুগের থেকে মেয়েদের অবস্থার খুব কিছু কি বদল ঘটেছে? এযুগের সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন এ প্রসঙ্গে খুব ভালো একটা কথা বলেছেন,— শাণিতবুদ্ধি, মগজওলা মেয়ে পুরুষের পছন্দ নয়। বাস্তবিক ভাবেই নিম্নমেধার, সংবেদনহীন পুরুষ এবং তার পরিবারের পক্ষে উন্নতরুচি ও মেধার নারী অসহনীয়। সত্যবতী, সুবর্ণলতারা আজীবন যে সংগ্রাম করে গেছে, তারই অনুবৃত্তি দেখি পরবর্তী কালের সাহিত্যিক বাণী বসুর ‘অমৃতা’, ‘গান্ধর্বী’, ‘অশ্বযোনি’ প্রভৃতি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রে। আজও ঘরে ঘরে, এমনকি আর্থিক ভাবে সক্ষম নারীকেও তার আত্মমর্যাদার জীবনের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অর্থাৎ ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে’।

ফিরে আসি, পুরনো কথায়। যে দেশে মেয়েদের অশ্রদ্ধার অপমানের বিবাহিত জীবন প্রসঙ্গে চিরকাল দুর্ভাগ্যের দোহাই দেওয়া হয়, সে দেশে তাদের পিতৃগৃহের জীবন খুব কি স্বস্তির? সত্যবতী, সুবর্ণলতার পিতৃগৃহের জীবন কি মসৃণ ছিলো? নানান আচার বিচারের বদ্ধতা অতিক্রম করে মুক্ত নিশ্বাস নেবার অবকাশ সেখানেও পায়নি সত্যবতী। আর সুবর্ণলতার জীবনে সুযোগ তৈরি হওয়ার আগেই চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। কিংবা তাদের মেধা, রুচির মূল্যায়ন তাদের পিতৃ পরিবারও করে নি। পিতৃগৃহেও মেয়েদের সম্পর্কে সম্মান দেওয়ার ভাবনা যে যুগের মূল্যবোধেই ছিলো না। সত্যবতীর বাবা রামকালী নিজে বিজ্ঞ চিকিৎসক, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সত্যবতীর চারিত্রিক সম্ভাবনা তিনিও বিচার করেননি। অযোগ্য পাত্রের পরিবারে মেয়েকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। শিক্ষিত, সামাজিক অবস্থানে - স্বতন্ত্র, রামকালীর সম্পর্কে যে মন্তব্য আশাপূর্ণা করেছেন, তা সে সময়ের সব পুরষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য— ‘‘মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা আছে তাঁর, শিক্ষা আছে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান সমীহ করবার, কিন্তু সমগ্র ‘মেয়েমানুষ’ জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ।’’

উনিশ শতকের একটি চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন আশাপূর্ণা, বাংলা বা বৃহত্তর অর্থে ভারতের সাধারণ পরিবারগুলিতে মেয়েদের সম্পর্কে সে ধারণা বা অনুভূতির বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। কোনও রকমে মেয়ে বিদায় করতে পারলে এখনও অনেক বাপ-মায়েরাই নিশ্চিন্ত হন।

একসময় সত্যবতী তার সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের দায়িত্ব নিতে চেয়েছে, মেয়েদের পড়িয়ে উপার্জন করে। যা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিরাট এবং বিরল বিদ্রোহ। ১৯২৯-এ রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের ‘লাবণ্য’ বা ১৯৩৪-এর ‘চার অধ্যায়’-এর ‘এলা’ বাংলাসাহিত্যের স্বাবলম্বী নারীর উদাহরণ। কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে সত্যবতীদের জগৎ অনেক অনেক আলাদা। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ঘরে বাইরে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, হাজার রকম সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা— সত্যবতীর জীবনকথা তারই এক নিরলস আখ্যান। নির্বোধ, সংবেদনহীন স্বামীর সঙ্গে একত্রে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে সে। তার জীবনের অনুবৃত্তি আরও ভয়াবহ ভাবে ঘটেছে তার মেয়ের জীবনে। কিন্তু কারুরই স্বামীর সঙ্গে মানসিক বন্ধন গড়ে ওঠেনি। আজও কি এমন অজস্র পরিবার নেই, যেখানে একই ঘরের ছাদের নীচে পাশাপাশি কেটে যায় কতো নারীপুরুষের জীবন, যাদের জৈবিক বন্ধন থাকে, কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে থাকে না কোনো অমৃত, যাকে জীবনানন্দের ভাষায় বলতে পারি ‘মননের মধু’।

তবু, অবক্ষয়িত অপচিত জীবনের ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকেও সত্যবতী, সুবর্ণলতারা আজীবন তাই সংগ্রাম করে, মাথা তুলে দাঁড়াবার। ‘অখদ্যে, অবদ্যে, মেয়েমানুষ’ নয়, চেষ্টা করে মানুষ পরিচয়ে বাঁচার। আজ যখন জানতে পারি, আমাদেরই ছাত্রীদের কোনো মা মেয়ের ফোন কেড়ে নেয়, এই মহামারীর সময় তাকে অনলাইন ক্লাস করতে দিতে চায় না, পড়াশোনা না করে সে শুধু ঘরের কাজ করুক কিংবা কোনো মায়ের পছন্দের অর্থবান পাত্রকে বিয়ে করতে না চাইলে মেয়েকে ঘরছাড়া হতে হয়, আপ্রাণ তাদের লড়াই করতে হয় শুধু পড়াশোনার জন্য, তখন যেনো একালের সত্যবতীদের দেখতে পাই। সত্যবতী, সুবর্ণলতা যেনো তাদের সামনে এসে, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস যোগায়। কঠোপনিষদের মন্ত্র দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম। “উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”— এই মন্ত্রের যে তাৎপর্য-ব্যাখ্যা বিবেকানন্দ করেছিলেন, “Arise, awake and stop not till the goal is reached.”— এই বাণীই আজকের সত্যবতীদের একমাত্র অবলম্বন হোক, এই প্রার্থনা নিয়ে আজকের বক্তব্য শেষ করি।

- আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষ্যে বাসন্তীদেবী কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতার (৮-৪-২০২১) পরিমার্জিত রূপ।